জনগণ হোক অগ্রাধিকার

প্রভাষ আমিন

বাংলাদেশের এখন এক নাম্বার সমস্যা কী? সাধারণ মানুষের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে বিবেচনা করলে অবশ্যই দ্রব্যমূল্য। আরো একটু বড় করে বললে অর্থনৈতিক সঙ্কটই এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। রিজার্ভ কমছে আর দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। 'দ্রব্যমূল্য বাড়ছে' এটুকু বললে অবশ্য পুরোটা বলা হয় না। দ্রব্যমূল্য আসলে আকাশ ছুঁয়ে আছে অনেক আগেই। নির্দিষ্ট আয়ের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস দশা। কেউ জানে না, এই সঙ্কট কবে শেষ হবে। জানলে তবু একটা প্ল্যান করা যেত। কিন্তু সেই প্ল্যান করারও কোনো উপায় নেই। কেউ জানে না পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে। দ্রব্যমূল্য সবচেয়ে বড় সঙ্কট বটে। কিন্তু গণমাধ্যমের শিরোনাম, টক শো'র আলোচনা দেখলে বোঝার উপায় নেই দেশ এমন এক মহাসঙ্কটে আছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অর্থনীতির সঙ্কটের আসল চিত্রটা নেই। আমরা সবাই ব্যস্ত রাজনীতি নিয়ে। বিএনপি আর আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি একদফাই যেন দেশের মূল সঙ্কট। রাজনীতিতে সঙ্কট আছে, অচলাবস্থা আছে। কিন্তু আগে তো মুখে খাবার জোগাতে হবে। তারপর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমাদের নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ সবার উচিত আগে একসাথে বসে অর্থনীতির সঙ্কট নিরসনের উপায় বের করা।

তবে অর্থনীতির সঙ্কট আছে বলেই রাজনীতি থেমে থাকবে তেমন তো কোনো কথা নেই। রাজনীতিও রাজনীতির মতো চলবে। ভালো হতো যদি রাজনীতিবিদরাও দ্রব্যমূল্যকে তাদের প্রায়োরিটিতে রাখতেন। তাদের কোনো আলোচনায় দ্রব্যমূল্যকে রাখতেন। কিন্তু তাদের দুই পক্ষেরই একদফার মূল কথা ক্ষমতা। বিএনপির একদফা হলো বর্তমান সরকারের পদত্যাগ। আর আওয়ামী লীগের একদফা হলো, সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন। কার প্রায়োরিটি কোনটা হবে সেটা নিয়ে আমার কোনো কথা নেই। সবাই নিশ্চয়ই নিজ নিজ স্বার্থটাই দেখবে। তবে সরকারের পদত্যাগ চাওয়ার দাবি করা এবং সেই দাবি আদায়ে কর্মসূচি পালন করার অধিকার সবারই আছে। প্রতিবাদ করার, সমাবেশ করার, মতপ্রকাশ করার অধিকার আমাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু সংবিধানেও এই অধিকার দেওয়া হয়েছে জনশৃঙ্খলার শর্তসাপেক্ষে। আপনি প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু আপনি আইন হাতে তুলে নিতে পারবেন না, কাউকে আঘাত করতে পারবেন না, সম্পদের ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রতিবাদ মানেই সহিংসতা, প্রতিবাদ মানেই ভাংচুর-অগ্নিসংযোগ। যত বেশি সহিংসতা, আন্দোলন তত বেশি তীব্র। এমনটাই ছিল পারসেপশন। অহিংস আন্দোলন করে নাকি দাবি আদায় করা যায় না। স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন, বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন বা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির আন্দোলন অহিংস ছিল না। দিনের পর

দিন হরতাল, অবরোধ, অগ্নিকাণ্ড, সন্ত্রাসের পথ বেয়েই আন্দোলন চলেছে। সন্ত্রাসের পথেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ২০১৪, ২০১৫ সালে বিএনপির আন্দোলনের নামে অগ্নিসন্ত্রাস বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসেই এক কালো অধ্যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে রাজনীতির নামে সহিংসতার এই ধারণা পাল্টে গেছে। বিএনপিও বুঝতে পেরেছে ২০১৪, ২০১৫ সালে অগ্নিসন্ত্রাস করে দাবি তো আদায় হয়ইনি, উল্টো তাদের নামের সাথে সন্ত্রাসী সংগঠনের তকমা জুটেছে। দেশে-বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীর নামে মামলা হয়েছে। সেই ধকল সামলাতে তাদের অনেক সময় লেগেছে।

গতবছর থেকে বিএনপি নতুন করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। গতবছর বিভাগীয় সমাবেশ করে সারাদেশে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল বিএনপি। তাদের প্রতিটি সমাবেশেই বিপুল লোকসমাগম হয়েছিল। নেতাকর্মীরাও দারুণ চাঙা হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় গত জুলাই থেকে সরকার পতনের একদফা আন্দোলন শুরু করে বিএনপি। এবার তারা নতুন রূপে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে বিএনপি অনেক সংযত ছিল। বিএনপি বারবার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অঙ্গীকার করেছে। সাম্প্রতিক অতীত বিবেচনায় আওয়ামী লীগও অনেক সংযত আচরণ করেছে। দুই পক্ষের এই সংযত আচরণের পেছনে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিরও একটা দারুণ প্রভাব আছে। বাংলাদেশের জন্য ঘোষিত নতুন ভিসানীতিতে বলা হয়েছে, যারা বাংলাদেশের অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে; তারা মার্কিন ভিসা পাবে না। এই ভিসা নীতি সরকারি ও বিরোধী দল সবার জন্যই প্রযোজ্য। ভিসা নীতির প্রভাবে রাজপথে দুই পক্ষই সংযত ছিল।

কিন্তু ২৮ অক্টোবর যেন রাজনীতির এই সংযমের বাধ ভেঙে গেল। বিএনপি ফিরে এলো তাদের পুরোনো চেহারায়। আবার হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, ককটেল, টিয়ার গ্যাস; আবার হরতাল। ২৮ অক্টোবরকে সামনে রেখে গত কয়েকদিন ধরেই রাজনীতিতে উত্তেজনা চলছিল। কিন্তু সেটা যে মাঠে এভাবে ফলে যাবে, এটা ভাবেননি অনেকে। আওয়ামী লীগ অনেকদিন ধরেই চাইছিল, বিএনপি যেন কোনো একটা ঝামেলা করে, যাতে তাদেরকে আবার সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিত্রিত করা যায় এবং সেই সূত্রে আবার দমন-পীড়ন চালানো যায়। বিএনপি আওয়ামী লীগের সেই চাওয়া নিপুণভাবে পূরণ করেছে। ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নির্বিঘ্নে তাদের শান্তি সমাবেশ করেছে। আর পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে নিজেদের সমাবেশ ফেলে পালিয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীরা।

এখন ২৮ অক্টোবরের এই সংঘাতে কার লাভ হলো, কার ক্ষতি হলো? ক্ষতিটাই আগে বলি।

ক্ষতি পুরোটাই হয়েছে বিএনপির। এমন নয়, ২৮ অক্টোবরের ঘটনা তাদের আন্দোলনকে চাঙা করে দেবে। বরং ২৮ অক্টোবরের সহিংসতার ফলে বিএনপি আরো পিছিয়ে যাবে। প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা, পুলিশ হত্যা, গাড়িতে আগুন, ভাংচুর, ককটেল বিস্ফোরনের অভিযোগে সরকার এখন বিএনপির ওপর আরেক দফা নিপীড়ন চালানোর যুক্তি খুঁজবে। আন্তর্জাতিক মহলের কাছেও এই যুক্তিগুলো তারা তুলে ধরতে পারবে। লাভ হয়েছে পুরোটাই সরকারের। তারা যেটা চাচ্ছিল, বিএনপি সেটা করে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আছে। টানা ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করবে, সরকার পতনের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করবে; এটাই স্বাভাবিক। বিএনপি আইনের বাইরে কিছু করলে সেটা দেখার জন্য আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। আওয়ামী লীগের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব বেশি। কিন্তু বিএনপি কোনো কর্মসূচি ডাকলেই আওয়ামী লীগকে তার পাল্টা কর্মসূচি ডেকে জনগণের ভোগান্তি ডাবল করতে হবে কেন? এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। আওয়ামী লীগ ডাকে 'শান্তি সমাবেশ'। কিন্তু একই দিনে দুই দলের কর্মসূচি থাকলে দুই দলের নেতাকর্মীরা মাঠে থাকেন, তাতে সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ে। শান্তি সমাবেশের নামে অশান্তির আশঙ্কা বাড়ায় আওয়ামী লীগ। যেহেতু বিএনপির কর্মসূচি ফলো করে আওয়ামী লীগ কর্মসূচি ঘোষণা করে, তাই উসকানির দায়টা আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে। বিএনপি ১ লাখ লোকের সমাবেশ করলে আওয়ামী লীগ দুইদিন পর ২ লাখ লোকের সমাবেশ করে তার জবাব দিতে পারে। একই দিনে সমাবেশ করা মানেই রাজনৈতিক জবাব নয়, এটা স্পষ্টতই উস্কানি।

২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ থেকে বিএনপির আন্দোলনের মহাযাত্রা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু এখন হচ্ছে আন্দোলনের উল্টোযাত্রা। বিএনপি

মহাসচিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের আরো অনেকে হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন। নেতাকর্মীদের নামে মামলা হবে। আরো অনেকে গ্রেপ্তার হবেন, অনেকে পালিয়ে বেড়াবেন। আন্দোলনের মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়াই কঠিন হবে। বিএনপির একদফা আন্দোলনের গন্তব্য কোথায় এখন? তাদের পরবর্তী কর্মসূচি কী? আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ঘোষিত হবে তফশিল। তাই তফশিল ঘোষণার আগেই সব দল নিজ নিজ অবস্থান সংহত করতে চাইবে। তাই নভেম্বর মাসটি হতে পারে ঘটনাবহুল, ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ। এখন বিএনপি যদি সরকার পতনের দাবি আদায় করতে না পারে, সরকার যদি নির্ধারিত সময়েই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়; বিএনপি কী করবে? কীভাবে ঠেকাবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার মতোও কেউ নেই এখন।

২৮ অক্টোবর স্বাভাবিকভাবে মহাসমাবেশ শেষ হলে বিএনপি কী কর্মসূচি দিতো, তা এখন আর জানার উপায় নেই। কিন্তু পণ্ড হয়ে যাওয়া সমাবেশ থেকে বিএনপি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেই পালিয়েছে। হরতালের পর এসেছে টানা তিনদিনের অবরোধ। হরতাল বা অবরোধে কি সরকারের পতন হয়ে যাবে? তাহলে এই অর্থহীন হরতাল-অবরোধ করে লাভ কী? এই হরতালে বিএনপির কোনো লাভ না হলেও দেশের অনেক ক্ষতি হবে। আমাদের ধুঁকতে থাকা অর্থনীতি আরো ঝুঁকিতে পড়বে। জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়বে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুবাদেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দারুণ মোমেন্টাম পেয়েছিল। কিন্তু বৈশ্বিক পরিস্থিতি সেই গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। অর্থনীতির এই দুঃসময়ে আমাদের যখন আরো বেশি করে স্থিতিশীলতা দরকার, তখনই আবার হরতাল-সহিংসতার যুগে ফিরলো বাংলাদেশ। শুধু অর্থনীতি নয়, বছরের শেষ প্রান্তে এসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি, তখন এই হরতাল আবার সেখানে বিঘ্ন ঘটাবে। আমার ভয়টা এখানেই। হরতালের জড়তা যখন কেটে গেছে, সামনে বিএনপি নিশ্চয়ই আরো হরতাল বা অবরোধ নিয়ে মাঠে নামবে। বা মাঠে নামতে না পারলে দূর থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করে নিজেরা পালিয়ে থাকবে। তবে এর মূল্য দিতে হবে জনগণকে।

শুরুতে যেমনটি বলেছিলাম, আমাদের রাজনীতিবিদদের কোনো অগ্রাধিকার তালিকায় জনগণ নেই। তারা মুখে বলেন, জনগণের জন্যই তাদের সকল রাজনীতি। কিন্তু কাজে করেন উল্টোটা। গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো; জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য। কিন্তু বাস্তবে হয় একেবারে উল্টোটা। আপনারাই বলুন, হরতাল বা অবরোধে জনগণের লাভটা কী হবে? জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করে দাবি আদায় করা আর জনগণকে জিম্মি করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করা এক কথা নয়। আমাদের এখানে বরাবরই জনগণকে জিম্মি করা হয়। সব দলই দাবি করে জনগণ তাদের সাথে আছে। কিন্তু আসলে জনগণ কী চায়, সেটা কি রাজনীতিবিদরা একবারও খোঁজ নিয়েছেন। বিএনপি বা আওয়ামী লীগের একদফার ব্যাপারে জনগণের কোনো ভূমিকা নেই, কোনো মতামতও নেই। যারা জনগণের কথা বলে রাজনীতি করছেন, তারা কি একবারও জনগণের কাছে জানতে চেয়েছেন, জনগণের দফা কী, তাদের চাওয়া কী? জনগণ চায় স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি, বাজারে পণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোট দেওয়ার অধিকার। সেই ব্যাপারে সরকারি বা বিরোধী দলের কোনো ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। বাজার দর আকাশ ছুঁয়েছে, তা নিয়ে সরকারি দলেরও কোনো মাথাব্যথা নেই, বিরোধী দলেরও কোনো কর্মসূচি নেই।

আমরা চাই, রাজনীতিবিদরা জনগণের কথা ভাবুন। তাদের অগ্রাধিকার হোক জনগণ।